প্রতিটি ঋতুর কৃষি গল্প

গ্রীষ্ম ১৪৩৩

ফসলিকা

চাষাবাদ ডটকম'র ঋতু ভিত্তিক ই-ম্যাগাজিন

পহেলা বৈশাখ : আমাদের কৃষি ও সংস্কৃতি

আউশ ধান চাষ ব্যবস্থাপনা

গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ: খরতাপ পেরিয়ে সম্ভাবনার কৃষি

বাংলাদেশের ফল রপ্তানির সম্ভাবনা

কৃষির প্রাণভোমরা ইউরিয়া: উৎপাদনে স্বনির্ভরতায় বাধা কোথায়?

ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষিকাজ

নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও প্রজন্ম ভাবনা

গ্রীষ্মকালে ছাদ কৃষি: শহুরে জীবনে স্মার্ট কৃষির নতুন দিগন্ত

প্রতিটি ঋতুর কৃষি গল্প

ফসলিকা

চাষাবাদ ডটকম'র ঋতু ভিত্তিক ই-ম্যাগাজিন

৭২ কদমতলী শি/এ
শ্যামপুর, ঢাকা

www.chashabad.com
chashabad.com@gmail.com

উপদেষ্টা সম্পাদক
এ. কে. আজাদ ফাহিম

সম্পাদক
মো. তাজ উদ্দিন সম্রাট

প্রকাশক
শাহ পারভেজ

নির্বাহী সম্পাদক
অনু চিছাম

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
রাসেল মাহবুব

সহযোগী সম্পাদক
এমরান আহমেদ
আজহারুল ইসলাম জীবন

গ্রাফিক্স ডিজাইনার
ওয়াজকুরনী ফকির

প্রকাশকাল:
বৈশাখ ১৪৩৩

বর্ষ: ০১ সংখ্যা: ০১ | গ্রীষ্ম ১৪৩৩ সংখ্যা

https://www.facebook.com/fosholika
ফোন: ০১৮২২২৮৩৭৫৬, ০১৭১৫৩৯৬৮৪৮, ০১৭৩৭৪০৮৯৪৬

পূর্ণ ঠিকানা ও ফোন নম্বরসহ নিকোষ (Nikosh) অথবা যেকোনো ইউনিকোডে ফন্টে কৃষি বিষয়ক মানসম্মত লেখা ই-মেইলে পাঠাতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।
chashabad.com@gmail.com

কৃষি ও কৃষকের কথা বলে

চাষাবাদ ডটকম

www.chashabad.com

এ ক টি কৃ ষি স ম্প্র সা র ণ উ দ্যো গ

সূচিপত্র

৫ সম্পাদকের কথা

৭ পহেলা বৈশাখ : আমাদের কৃষি ও সংস্কৃতি
অধ্যাপক আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ

৯ ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষিকাজ
শাহ পারভেজ

১১ আউশ ধান চাষ ব্যবস্থাপনা
আল মোস্তাকিম মাহদী নোমান

১৩ গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ: খরতাপ পেরিয়ে সম্ভাবনার কৃষি
কৃষিবিদ শাহ পরান

১৫ সবার জন্য চাষাবাদ
কৃষিবিদ ফাহিম আবুল কালাম

১৮ পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ও কৃষিপণ্যের গুণাগুণ: একটি সমন্বিত বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি
অনু চিছাম

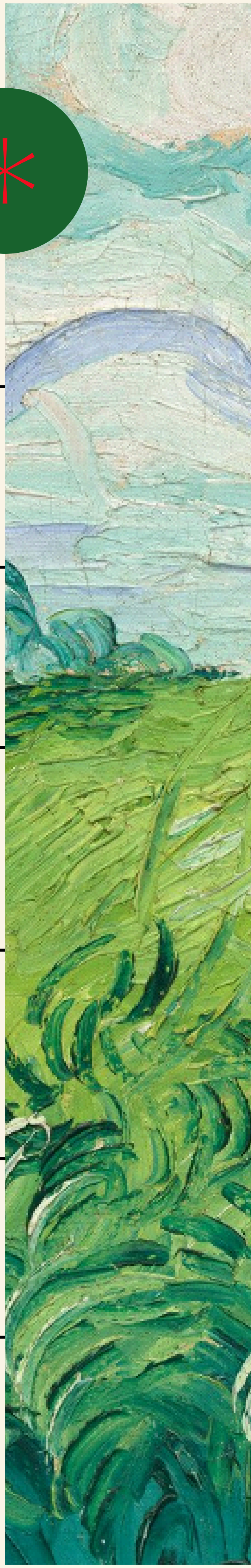

সূচিপত্র

গ্রীষ্মকালে ছাদ কৃষি: শহুরে জীবনে স্মার্ট কৃষির নতুন দিগন্ত — ২০
সালাহ্ উদ্দিন

জৈবিক ও পরিবেশসম্মতভাবে গ্রীষ্মকালীন বিভিন্ন ফসলের ইঁদুর ব্যবস্থাপনা — ২১
অধ্যাপক ড. মো. শামীম হোসেন নোমান

নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও প্রজন্ম ভাবনা — ২৩
মো. তাজ উদ্দিন সম্রাট

বাংলাদেশের ফল রপ্তানির সম্ভাবনা — ২৫
এমরান আহমেদ

কৃষির প্রাণভোমরা ইউরিয়া: উৎপাদনে স্বনির্ভরতায় বাধা কোথায়? — ৩০

নিয়মিত বিভাগ
কবিতা, কৃষকের হাসিমুখ, মৌসুমি কৃষি পরামর্শ

সম্পাদকের কথা

বাংলা নববর্ষ আমাদের কাছে শুধু একটি দিন নয়, এটি নতুন করে শুরু করার এক গভীর প্রেরণা। কৃষি, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মিলিত স্রোতে গড়ে ওঠা এই সময়টি বাঙালির জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আমাদের ইচ্ছা ছিল পহেলা বৈশাখেই "ফসলিকা"র এই সংখ্যা পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু কিছু অনিবার্য বাস্তবতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। এই বিলম্বের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

তবে এই সামান্য দেরি আমাদের থামিয়ে দেয়নি, বরং আরও প্রস্তুত হতে সাহায্য করেছে। সেই প্রস্তুতির ফল হিসেবেই "ফসলিকা গ্রীষ্ম ১৪৩৩" আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে একটি সমন্বিত প্রয়াস হিসেবে।

এই সংখ্যার প্রতিটি লেখায় কৃষির বহুমাত্রিক দিক ফুটে উঠেছে। কোথাও শেকড়ের টান, কোথাও খরতাপের মধ্যেও সম্ভাবনার কথা, কোথাও নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির প্রশ্ন, আবার কোথাও পরিবেশবান্ধব কৃষির দিকনির্দেশনা। কৃষি এখানে শুধু পেশা নয়, এটি জীবন, এটি ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা।

বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতা আমাদের নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। কৃষি আজ শুধু খাদ্যের উৎস নয়, অর্থনীতিরও শক্ত ভিত্তি। ফল রপ্তানির সম্ভাবনা আমাদের কৃষিকে বৈশ্বিক বাজারে নতুন পরিচয় দিতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের প্রশ্ন এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে কৃষিকে কেন্দ্র করে একটি সচেতন, দায়িত্বশীল ও টেকসই ভাবনার প্রয়োজন। একই সঙ্গে আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, "ফসলিকা"কে নিয়মিত একটি প্রকাশনা হিসেবে গড়ে তোলার আন্তরিক ইচ্ছা আমাদের রয়েছে। এটি যেন ঋতুভিত্তিক কৃষি, সংস্কৃতি ও জীবনের ধারাবাহিক দলিল হয়ে উঠতে পারে, সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আপনাদের মতামত, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণই এই পথচলার সবচেয়ে বড় শক্তি।

আমাদের বিশ্বাস, কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক যত দৃঢ় হবে, ততই শক্ত হবে আমাদের ভবিষ্যৎ।

নতুন বছরের এই প্রারম্ভে আমাদের প্রত্যাশা, কৃষির প্রতি ভালোবাসা ফিরে আসুক, প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনোভাবে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হোক, আর গড়ে উঠুক একটি নিরাপদ ও টেকসই খাদ্যব্যবস্থা।

শুভ নববর্ষ।
শুভ হোক আমাদের কৃষির অগ্রযাত্রা।

মো. তাজ উদ্দিন সম্রাট
সম্পাদক

"নিয়মিত প্রকাশনার পথে, ফসলিকা হতে চায় বাংলাদেশের কৃষি ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক দলিল।"

সবজি বীজে সেরা
সুপ্রীমের হীরা
ঋতু ভিত্তিক
ই-ম্যাগাজিন
'ফসলিকা'-র জন্য
শুভেচ্ছা
মোঃ ফজলুল করিম রাসেল
সিনিয়র রিজিওনাল ম্যানেজার
সিলেট রিজিওন
Supreme Seed
সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ

মানিক অ্যাগ্রো সার্ভিস প্রোভাইডার
(Manik Agro Service Provider)
ঠিকানাঃ কচুয়া বাজার, সাঘাটা, গাইবান্ধা
সারাদেশে মানসম্মত কৃষি সেবা
মোবাইলঃ ০১৮৭৩-০৪৩৭৫৬,
০১৭২৪-১৫৫৪৩৬
সারাদেশে মানসম্মত বীজ, চারা, কাটিং-সহ
যাবতীয় কৃষি পণ্য ও সেবা সরবরাহ করা হয়।

নববাংলা সমন্বিত কৃষি খামারের একটি উদ্যোগ
নববাংলা
নববাংলা স্পেশাল
জি.আই নেট
যুগ থেকে যুগ মরিচা না পড়ার নিশ্চয়তা
ডেলিভারী ও ফিটিংস
সার্ভিস ফ্রি
01815-418826
01916-445444
নববাংলা জি.আই নেট ফ্যাক্টরী, পুজকরা (উঃ)
(ঢাকা-নোয়াখালী মহাসড়কের পূর্ব পার্শ্বে) নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।

পহেলা বৈশাখ : আমাদের কৃষি ও সংস্কৃতি

অধ্যাপক আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ

আমরা প্রায়শই বলে থাকি, কৃষিই কৃষ্টি। 'কৃষ্টি' শব্দের অর্থ কর্ষণ, লাঙল চালনা, কৃষিকর্ম বা সংস্কৃতি। এ থেকেই বোঝা যায়, এ অঞ্চলের সংস্কৃতি মূলত কৃষিনির্ভর। পহেলা বৈশাখ, যার আদ্যোপান্ত আমাদের কৃষি, প্রকৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য রেখে কৃষক তার ফসলকে খাদ্যে রূপান্তরিত করে। মুঘল আমলে শস্য উৎপাদন ও খাজনা আদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। ফলে বাংলা নববর্ষ হয়ে ওঠে নতুন ফসলচক্রের সূচনা।

প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ ফসল উৎপাদনের সুবিধার্থে বছরকে মাস ও ঋতুতে বিভক্ত করেছে। পূর্ণিমার চাঁদ যে নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থান করত, সেই নক্ষত্রের নামানুসারেই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ প্রভৃতি মাসের নামকরণ করা হয়। বাংলা সনের প্রাচীন ইতিহাস পুরোপুরি নির্ধারিত না হলেও জানা যায়, রাজা শশাঙ্কের আমলে বাংলা সনের ব্যবহার ছিল এবং সে সময় অগ্রহায়ণ মাসকে বছরের প্রথম মাস হিসেবে ধরা হতো। 'অগ্র' অর্থ প্রথম এবং 'হায়ণ' অর্থ বছর। হেমন্তের নতুন ধান ও নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে তখনই নববর্ষ উদযাপিত হতো।

মানুষ চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্রের গতিবিধি, ঋতুর পরিবর্তন, ঝড়-বৃষ্টি ও তাপমাত্রার ওঠানামা দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে এসেছে এবং এই জ্ঞানকে কৃষিকাজে প্রয়োগ করেছে। ফসল উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট সময়চক্রের মধ্যে সম্পন্ন হয়, যা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এ কারণেই বাংলা সনের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ফসল রোপণ ও সংগ্রহের মৌসুম অনুযায়ী এই সনের ব্যবহার সহজতর ছিল, এজন্য একে 'ফসলি সাল'ও বলা হয়।

মুঘল সম্রাট আকবরের নির্দেশে পণ্ডিত আমির ফতেহউল্লাহ সিরাজী বাংলা সনকে সুসংগঠিত করেন। তখনকার সুবে বাংলায় এটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থেও এই সনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বৈশাখ মাসে দিন বড় এবং পথঘাট তুলনামূলক শুষ্ক থাকায় জমিদারদের জন্য কর আদায় সহজ হতো, যা অগ্রহায়ণের তুলনায় অধিক সুবিধাজনক ছিল।

অতীতে সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মধ্যে ছিল দৃঢ় সম্পর্ক। কৃষিপণ্য উৎপাদন, বিপণন এবং লেনদেন পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হতো। কৃষিজীবী সমাজে 'আমানী'সহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক আচার প্রচলিত ছিল। নতুন ফসল বিক্রির অর্থে কৃষকরা পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতেন এবং বছরের প্রথম দিনে পুরোনো হিসাব পরিশোধ করে নতুন হিসাব শুরু করতেন।

এই প্রেক্ষাপটে 'হালখাতা' একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টিমুখ করানোর মাধ্যমে নতুন খাতা খোলেন, যা পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও বিশ্বাসের প্রতীক। লাল-সাদা রঙের ব্যবহারও এই হালখাতার ঐতিহ্য থেকেই এসেছে—লাল মলাটে বাঁধাই করা সাদা পাতার খাতা ছিল এর প্রতীক।

কৃষি ও অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গ্রামীণ মেলা। নতুন ফসল ঘরে তোলার পর কৃষকরা নদীতীর, বৃক্ষছায়া বা খোলা প্রান্তরে সমবেত হয়ে পণ্য বিনিময় করতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সমাবেশই রূপ নেয় গ্রামীণ মেলায়, যা গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

ঐতিহ্যগতভাবে বৈশাখের প্রথম দিনে 'হাল বৈশাখ' পালনের রীতি ছিল। প্রতিটি জমিতে প্রতীকীভাবে লাঙল চালানো হতো। গৃহপালিত গরুকে স্নান করিয়ে কপালে সিঁদুর দেওয়া, কৃষি উপকরণ পরিষ্কার করা এবং খিচুড়ি রান্না করে খাওয়ার মধ্য দিয়ে এই উৎসব উদযাপিত হতো। ক্ষেতের মধ্যে শস্যের মঙ্গল কামনায় সাজানো ফুল পুঁতে দেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল।
চৈত্রসংক্রান্তিও কৃষিজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আচার। এদিন চৌদ্দ প্রকার শাক সংগ্রহ করে খাওয়ার প্রথা প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও পরিবেশের সুস্থতার একটি প্রতীক। এটি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের একটি বাস্তব মূল্যায়নও বটে।

প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বিদ্যমান। মানুষ একসময় বিশ্বাস করত, প্রকৃতির মধ্যেই জীবনের সকল উপাদান নিহিত। তাই প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার একটি সহমর্মিতামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।
কিন্তু আধুনিকতার প্রভাবে কৃষিভিত্তিক অনেক আচার-অনুষ্ঠান আজ বিলুপ্তির পথে। যদি আমরা টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি, তবে কৃষি, মানুষ ও প্রকৃতির এই হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। যে কৃষি ও প্রকৃতি আমাদের জীবন ধারণের ভিত্তি, তা রক্ষা করতে পারলেই আমাদের ঐতিহ্য ও উৎসব টিকে থাকবে।

বাঙালির চিরন্তন উৎসবগুলো আপন মহিমায় বেঁচে থাকুক—এই প্রত্যাশায় সবাইকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা।

লেখকঃ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক।

আমার বৈশাখ, আমার পরিচয়

– নির্মল ভৌমিক (চাষীবন্ধু)

আমি বাঙালি—
মাটির গন্ধে গড়া আমার প্রাণ,
ধানের শিষে দোলে আমার গান,
নদীর স্রোতে বয়ে চলে আমার ইতিহাস।

পহেলা বৈশাখ তাই—শুধু একটি দিন নয়,
এ যেন নতুন সূর্যের আহ্বান,
পুরোনো সব দুঃখ ভুলে
আবার শুরু করার এক মহাকাব্য।

আলপনায় আঁকা স্বপ্নগুলো,
লাল-সাদার রঙে মিশে যায় হৃদয়,
আনন্দ শোভাযাত্রার ঢাকের তালে
জেগে ওঠে হাজার বছরের পরিচয়।

এই আমার ঐতিহ্য—
নকশিকাঁথার গল্প,
বাউলের সুর,
পান্তা-ইলিশের সরলতায় ভরা এক উৎসব।

এই আমার সংস্কৃতি—
ভাষার জন্য রক্ত দেওয়া,
ভালোবাসায় বোনা এক অদম্য আত্মা,
যা কখনো হারায় না, কখনো ম্লান হয় না।

আমি বাঙালি—
তাই গর্বে বলি বারবার,
আমার বৈশাখ, আমার সংস্কৃতি,
আমার অস্তিত্বের অহংকার।

ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষিকাজ

শাহ পারভেজ

পৃথিবীর প্রথম মানব হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আজ পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা প্রায় ৮০০ কোটির বেশি। প্রাণীর সংখ্যাও অগণিত। এই বিপুল পরিমাণ মানুষ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আর এই খাদ্যের পুরো জোগানই আসে কৃষি থেকে।

আজকের লেখায় আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে কৃষিকাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করব।

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি তাকে অঙ্কুরিত কর, না আমিই অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি।"
(সূরা ওয়াক্বিয়াহ: ৬৩-৬৫)

একজন মুমিন হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআলাই আমাদের রিজিকদাতা। উপরোক্ত আয়াতটি সে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। পবিত্র কোরআনে আরও বলা হয়েছে, "তিনি পশুকুল সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে শীত নিবারণের উপকরণ, নানা উপকার এবং এগুলো থেকে তোমরা আহার লাভ কর।"
(সূরা নাহল: ৫)

আবার বলা হয়েছে, "তিনি জলরাশিকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ আহার করতে পারো।"
(সূরা নাহল: ১৪)

মহান আল্লাহর অশেষ কুদরতের মাধ্যমেই আমরা মাটি থেকে ফসল উৎপাদন করি। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
"মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক। আমি তো অঝর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, অতঃপর মাটিকে বিদীর্ণ করেছি এবং তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙুর, শাকসবজি, জলপাই, খেজুর, ঘন বাগান, ফল-ফলাদি ও ঘাস। এগুলো তোমাদের ও তোমাদের পশুকুলের জীবিকার জন্য।"
(সূরা আবাসা: ২৪–৩২)

কোরআন মজিদে আরও বলা হয়েছে, "বল, কে সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন? অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেছি।"
(সূরা আন-নামল: ৬০)

এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলাই আমাদের রিজিক দান করেন এবং সেই রিজিকের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কৃষিকে নির্ধারণ করেছেন। তাই কৃষিকাজে মনোনিবেশের মাধ্যমে মানুষ হালাল ও বরকতময় জীবিকা অর্জন করতে পারে।

এবার দেখা যাক, বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) কৃষিকাজ সম্পর্কে কী বলেছেন। রাসূল (সা.) বৃক্ষরোপণকে সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি

বলেন, “কোনো ব্যক্তি যদি গাছ রোপণ করে এবং তা থেকে মানুষ, পাখি বা পশু আহার গ্রহণ করে, তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।”
(সহিহ মুসলিম: ২৯০০)

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, “কোনো মুসলিম যদি গাছ রোপণ করে বা ফসল উৎপাদন করে এবং তা থেকে মানুষ, পাখি বা প্রাণী আহার গ্রহণ করে, তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।”

“কৃষিতে নেই কোনো হীনমন্যতা—বরং আছে আভিজাত্য, সম্মান ও মানবকল্যাণের অশেষ সম্ভাবনা।”

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, কৃষি কাজ বা গাছ লাগানো জীবিকার একটা স্বাভাবিক মাধ্যম এবং কৃষিকাজ শুধু জীবিকার মাধ্যমই নয়, বরং এটি সওয়াব অর্জনের একটি উত্তম পথ।

কৃষিকাজের গুরুত্ব আমরা রাসূল (সা.)-এর আরও কিছু হাদিস থেকেও জানতে পারি। তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো পতিত জমি আবাদ করে, সে সেই জমির মালিক হওয়ার অধিকার রাখে।”
(সহিহ বুখারি)

আরও বলা হয়েছে, “যার জমি আছে, সে যেন নিজেই তা চাষ করে। যদি নিজে চাষ করতে না পারে, তবে

তা পতিত না রেখে অন্য ভাইকে দিয়ে দেয়।”
(সহিহ মুসলিম)

এসব হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যে, জমি পতিত রাখা উচিত নয়; বরং তা সর্বদা উৎপাদনমুখী রাখা উচিত।
রাসূল (সা.) পশুপালনকেও উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, “তোমরা ভেড়া পালন করো, কারণ এরা সকাল সন্ধ্যায় তোমাদের জন্য সু সংবাদ বয়ে আনবে।”

এছাড়াও জানা যায়, সকল নবী-রাসূল পশুপালনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুতরাং কৃষিতে লজ্জা নেই আছে গৌরব ও পূন্য অর্জনের বিরাট সুযোগ।

ইসলামে কৃষককে মর্যাদার চোখে দেখা হয়েছে। হজরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে কৃষিকাজের সূচনা হয় এবং পরবর্তীতে বহু নবী-রাসূল এই পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর সম্পর্কেও বলা হয় যে, তিনি কৃষিকাজ করতেন। কৃষিকে আল্লাহর নবীদের অধিকাংশই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাই, ইসলামে এর মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষিকাজে কোনো হীনমন্যতার সুযোগ নেই; বরং এতে রয়েছে সম্মান ও সওয়াব অর্জনের বিরাট সম্ভাবনা।

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, কৃষিতেই রয়েছে আভিজাত্য, মর্যাদা ও কল্যাণ।

আউশ ধান চাষ ব্যবস্থাপনা

আল মোস্তাকিম মাহদী নোমান

মাঠ পর্যায়ে এখন বোরো ধান কাটা প্রায় শেষ পর্যায়ে। জমির ধান শতকরা ৮০ পাকলে জমির ধান কেটে সংগ্রহ করে ভালোভাবে মাড়াই-ঝাড়াই করে সংরক্ষণ করতে হবে। আউশ ধানের বীজ ইতোমধ্যে বোনা হয়ে যাওয়ার কথা। না হয়ে থাকলে দেরি না করে এক্ষুণি বপন করতে হবে।

আউশ ধানের আবাদ বৃষ্টি নির্ভর, ফলে এ ধান উৎপাদনের সেচ খরচ সাশ্রয় হয়। তাছাড়া উচ্চফলনশীল (উফশী) জাতের ধান চাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। আউশ ধানের বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ১৫-৩০ চৈত্র। বোনা আউশ এবং রোপা আউশ দুইভাবে চাষ করা হয়।

বিভিন্ন জাত:

বোনা আউশের জনপ্রিয় আধুনিক জাত ব্রিধান ৪৩, ব্রিধান ৬৫, ব্রিধান ৮৩ এবং বিনাধান-১৯। রোপা আউশের উফশী জাত হিসেবে বিআর২৬, ব্রিধান৪৮, ব্রিধান ৫৫, ব্রিধান৮২ ও ব্রিধান৮৫ এবং বোনা আউশের উফশী জাত হিসেবে বিআর২০, বিআর২১, বিআর২৪, ব্রিধান ৪২, ব্রিধান ৪৩, ব্রিধান ৮৩ আবাদ করা যায়।

বীজতলায় চারা রোপন করার আগে ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হবে। বীজতলায় প্রতি বর্গমিটার বেডে ৮০-১০০ গ্রাম অঙ্কুরিত বীজ সমানভাবে বুনে দিতে হবে। সাধারণত জমিতে ২০-২৫ দিনের চারা রোপণ করা হয়। রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকলেই চলে। ১ হেক্টর জমিতে ৮-১০ কেজি বীজের চারা লাগে। সারিতে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি। রোপনের আগে ভালোভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে। অধিক ফলন পাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জৈবসারসহ সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

ইউরিয়া সার তিন ধাপে (প্রথম ধাপে জমি শেষ চাষের সময়, দ্বিতীয় ধাপে চারা রোপণের ১৫ দিন পর, তৃতীয় ধাপে কাচা থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে) এবং অন্যান্য সার জমি শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করা হলে

কম সেচ, কম খরচে অধিক ফলন—সঠিক ব্যবস্থাপনায় আউশ ধান হতে পারে কৃষকের লাভজনক বিকল্প

“২০–২৫ দিনের সুস্থ সবল চারা এবং সঠিক দূরত্বে রোপণ করলে ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।”

টিএসপি সারের সমপরিমাণ ডিএপি সার ব্যবহার করে প্রতি কেজি ডিএপি সার ব্যবহারের জন্য ৪০০ গ্রাম হারে ইউরিয়া কম ব্যবহার করতে হবে।

পরিচর্যা:

আউশের জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। ধানের চারা রোপণের পর জমিতে অন্তত ১০-১২ দিন ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। সম্পূরক সেচযুক্ত ধানের ফলন হেক্টরে প্রায় ১ টন বেশি হয়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনের জন্য নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করতে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে রোপা আউশের জমিতে ৮-১০ ফুট দূরে দূরে ধৈঞ্চার চারা রোপণ করতে হবে অথবা কয়েকটি বাঁশের কঞ্চি/গাছের ডাল পুঁতে দিতে হবে। মাজরা এবং বাদামি ঘাসফড়িং পোকা দমনে প্রয়োজনে কীটনাশক সানটাপ বা একতারা বা প্লেনাম ব্যবহার করা যেতে পারে। থ্রিপস, সবুজ পাতা ফড়িং ও গান্ধি পোকা দমনের জন্য কার্বোসালফান গ্রুপের কীটনাশক মারশাল ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্লাস্ট, খোলপড়া হলে নাটিভো, এমিস্টার টপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

এসব পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ধানের ফলন বৃদ্ধি হবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি বিভাগে যোগাযোগ করতে হবে।

লেখক:
শিক্ষার্থী, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ: খরতাপ পেরিয়ে সম্ভাবনার কৃষি

কৃষিবিদ এম. এম. শাহ পরান

বাংলা বছরের সূচনা বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠের প্রখর দিনগুলো সাধারণত খরতাপের মৌসুম হিসেবে পরিচিত। তবে কৃষির দৃষ্টিকোণ থেকে এই সময়টি শুধু চ্যালেঞ্জের নয়; বরং সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি হতে পারে সম্ভাবনাময় উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষের ক্ষেত্রে এই সময়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

এই সময়ে তাপমাত্রা প্রায়ই ৩৫–৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। তীব্র রোদ, শুষ্ক বাতাস ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে। মাটির উপরিভাগ দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ায় গাছ প্রয়োজনীয় পানি ও পুষ্টি গ্রহণে ব্যাহত হয়। পাশাপাশি জ্যৈষ্ঠ মাসে কালবৈশাখী ঝড় হঠাৎ ফসলের ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই এই মৌসুমে কৃষির প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো তাপমাত্রা ও মাটির আর্দ্রতার ভারসাম্য বজায় রাখা।

গ্রীষ্মকালীন সবজি নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল ও দ্রুতবর্ধনশীল ফসল নির্বাচন করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। ঢেঁড়স, করলা, শসা, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, কাকরোল এবং বিভিন্ন শাকজাতীয় ফসল এই সময়ে উপযোগী। বিশেষ করে লতাজাতীয় সবজিগুলো মাচা পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন বাড়ার পাশাপাশি গাছ সুস্থ থাকে। এতে গাছ মাটির অতিরিক্ত তাপ থেকে রক্ষা পায় এবং বাতাস চলাচল সহজ হয়।

চাষের শুরুতেই জমি নির্বাচন ও প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি দ্রুত নিষ্কাশন হয় এমন উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার যেমন পচা গোবর, কম্পোস্ট বা ভার্মি কম্পোস্ট মিশিয়ে নিতে হবে। জৈব পদার্থ মাটির গঠন উন্নত করে, পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মাটির জীবন্ততা বজায় রাখে।

বীজ বপনের ক্ষেত্রেও কিছু কৌশল অনুসরণ করা প্রয়োজন। অধিক তাপমাত্রায় অঙ্কুরোদগম ব্যাহত হতে পারে। এ সমস্যা এড়াতে বীজ বপনের আগে কয়েক ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখা যেতে পারে। এতে অঙ্কুরোদগম দ্রুত হয়। পাশাপাশি বীজতলায় অস্থায়ী ছায়া দিলে চারার বৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকে।

সেচ ব্যবস্থাপনা এই মৌসুমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গরমে গাছ দ্রুত পানি হারায়, তাই মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা জরুরি। ভোর বা বিকেলে নিয়মিত সেচ দিলে পানি অপচয় কম হয়। ড্রিপ সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করলে পানি সাশ্রয় হয় এবং গাছ প্রয়োজন অনুযায়ী পানি পায়।

মালচিং পদ্ধতি গ্রীষ্মকালীন চাষে অত্যন্ত কার্যকর। খড়, শুকনো পাতা বা পলিথিন দিয়ে মাটির উপরিভাগ ঢেকে দিলে সূর্যের তাপ সরাসরি মাটিতে পড়ে না। এতে মাটির আর্দ্রতা দীর্ঘসময় ধরে বজায় থাকে এবং আগাছার বৃদ্ধি কমে যায়।

গরম মৌসুমে পোকামাকড়ের আক্রমণও বৃদ্ধি পায়। ফল ছিদ্রকারী পোকা, সাদা মাছি, থ্রিপস ইত্যাদি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তাই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা জরুরি। ফেরোমন ফাঁদ, স্টিকি ট্র্যাপ, আলোক ফাঁদ এবং নিমভিত্তিক জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব উপায়ে পোকা দমন করা সম্ভব। পুষ্টি ব্যবস্থাপনায়ও ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের পাশাপাশি

জিংক, বোরনসহ অণুপুষ্টি সরবরাহ করলে গাছ সুস্থ থাকে। তবে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে জৈব সারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বর্তমান নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে ছাদ বাগান গ্রীষ্মকালীন সবজি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সীমিত জায়গায় টব, ড্রাম বা জিও ব্যাগ ব্যবহার করে সহজেই সবজি চাষ করা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে নিয়মিত সেচ, ছায়া প্রদান ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

বাজার ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও এই মৌসুমটি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় এ সময়ে সবজির সরবরাহ কম থাকে, ফলে কৃষকরা ভালো দাম পান। পরিকল্পিত উৎপাদন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হতে পারে। সবশেষে বলা যায়, বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠের তীব্র গরম কৃষির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হলেও সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটিকে সুযোগে রূপান্তর করা সম্ভব। টেকসই কৃষি প্রযুক্তি, জৈব পদ্ধতি এবং সময়োপযোগী পরিচর্যার সমন্বয়ই গ্রীষ্মকালীন সবজি উৎপাদনে সাফল্য এনে দিতে পারে।
গ্রীষ্মের খরতাপকে ভয় নয়, বরং সঠিক ব্যবস্থাপনায় তা-ই হোক উৎপাদনের নতুন সম্ভাবনার দ্বার।

সবার জন্য চাষাবাদ

কৃষিবিদ ফাহিম আবুল কালাম

> “কৃষি বাঁচলে দেশ বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে।”

আজ আমি একটি গল্প বলতে চাই। এটি কোনো রূপকথা নয়। এই গল্পের কাহিনী আমাদের সবারই পরিচিত, তবুও কেন জানি আমরা ধীরে ধীরে এ গল্প থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি। আমরা ভুলতে বসেছি আমাদের শেকড়, আমাদের ইতিহাস। কর্পোরেট পরিচয়ের চকচকে আবরণে আমরা যেন নিজেরাই নিজেদের আড়াল করে ফেলছি।

এই গল্পের প্রেক্ষাপট আমাদের চারপাশ, আর এর চরিত্র আমাদেরই বাবা-মা, দাদা-দাদী, পরদাদা-পরদাদিরা। এটি ছিল স্বনির্ভরতার গল্প, ছিল সমৃদ্ধির গল্প, ছিল একতার গল্প। সেই গল্পে আমাদেরও থাকার কথা ছিল, কিন্তু আমরা যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছি।

একসময় আমাদের গোলাভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল, পুকুরভরা মাছ ছিল। আমাদের মাটি ছিল উর্বর, প্রকৃতি ছিল সবুজ ও প্রাণবন্ত। আমরা বিশুদ্ধ নিঃশ্বাস নিতে পারতাম। খাদ্য হয়তো সীমিত ছিল, কিন্তু নিরাপদ ছিল। আমাদের মায়েরা দোয়া করতেন, “আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।” আমাদের পরিচয় ছিল “মাছেভাতে বাঙালি।”

আমরা কৃষক ছিলাম। আমাদের গল্পটা মূলত কৃষকের গল্প। অথচ আজ সেই গর্বের পরিচয় দিতে আমরা সংকোচ বোধ করি। আমরা গর্ব করে বলি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কর্মকর্তা; কিন্তু বলতে দ্বিধা করি, “আমার বাবা একজন কৃষক।” সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের সেই পরিচয় থেকে দূরে সরে এসেছি। কৃষক পরিবারের সন্তানরা এখন যেন অপেক্ষা করে কবে তারা এই পরিচয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। নিজেদের অতীত মুছে ফেলে সন্তানদের শেখাচ্ছে যে তাদের পিতা একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অ্যাডভোকেট, ব্যবসায়ী, প্রবাসী, সরকারি কর্মকর্তা ইত্যাদি। অথচ একসময় সব পেশার মানুষেরই মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। পেশা যাই হোক, সবারই একটি নাড়ির টান ছিল গ্রাম ও কৃষির সঙ্গে।

পড়াশোনার পাশাপাশি কৃষিকাজে সহায়তা করা ছিল স্বাভাবিক বিষয়। এতে সামাজিক মর্যাদা কমেনি, বরং বেড়েছে। গ্রামে লোকটি পেশায় যে কাজই করেন না কেন, তার সম্পর্ক মাঠের সঙ্গে জড়িত ছিল। স্কুলে বা অফিসে যাওয়ার আগে গরুর খাবারের বন্দোবস্ত নিশ্চিত করেই যেতেন। জীবিকার তাগিদে কেউ শহরে গেলেও কৃষিকে পুরোপুরি বাদ দিতেন না।

কিন্তু একসময় শুরু হয় শেকড় কাটা। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে একক পরিবারে রূপ নেয়, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের বাইরে পরিবারে

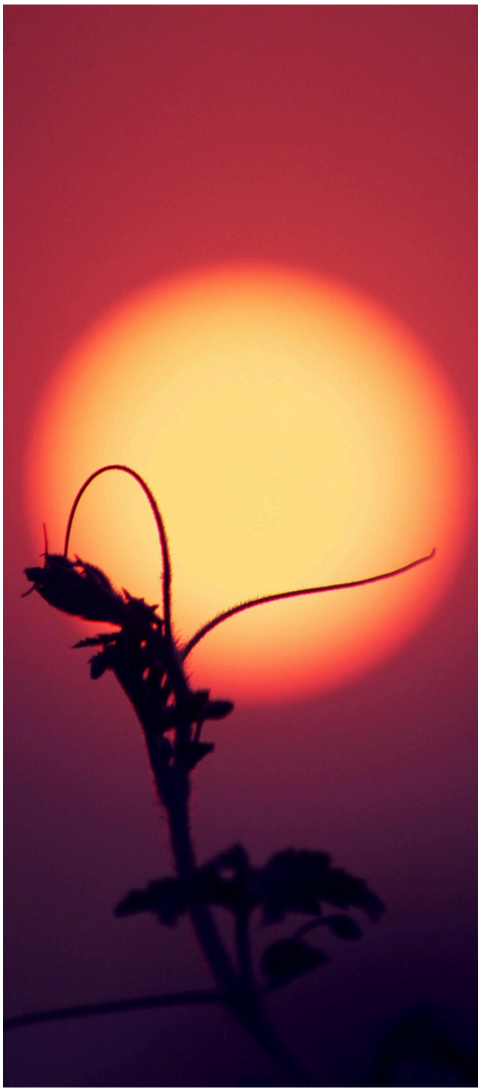

আর কারো অস্তিত্ব নেই। জমিজমাও ভাগ হতে থাকে। বয়স্ক কৃষকেরা একা হয়ে পড়েন, ধীরে ধীরে কৃষির হাল ছেড়ে দেন। কারণ পরিবারের সাপোর্ট আগের মতো থাকে না। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যার যার কাজে।

শুরু হয়ে যায় কৃষিকে শুধু লোকসানের খাত হিসেবে দেখা। খোরাকির জন্য চাল-ডাল কিনলেই হয়, চাষাবাদ কেন করতে হবে, এমন ধারণা তৈরি হয়। দুধের জন্য গাভী পালা হাতি পালার মতো মনে হতে থাকে। জমি বর্গা দেওয়া, বাজার থেকে খাদ্য কেনা, এসবই হয়ে ওঠে সহজ সমাধান। ফলে আমাদের ঐতিহ্যের কৃষি ধীরে ধীরে প্রান্তিক মানুষের পেশায় পরিণত হয়। "চাষাভুষার কাজ" বলে অবজ্ঞা করা শুরু হয়। অন্যদিকে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে, খাদ্যের চাহিদা বাড়ে, কিন্তু উৎপাদনের ভারসাম্য নড়বড়ে হয়ে ওঠে।

আগে গ্রামে ঘরে ঘরে গরু ছিলো, গরুর দুধের পর্যাপ্ত যোগান ছিলো। সেই তুলনায় ভোক্তার সংখ্যা কম ছিলো। দুধ উৎপাদনকারীদের দুধ বিক্রি করতে হতো হাটে গিয়ে। এখন সকলেই দুধ খেতে চায়। সামর্থ্য বেড়েছে। কিন্তু কয়েক গ্রাম খুঁজলে পরে একটা দুধের গরু পাওয়া যায়। পুকুরে বড় মাছটা ধরা পড়লে আগে সেটা কিনে খাওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল নগন্য। এখন সকলেই কমবেশি বড় মাছ কিনে খাওয়ার মতো সামর্থ্যবান। অথচ গ্রামে পুকুরের সংখ্যা কমে গেছে। অথবা ভাগাভাগির রেশারেশিতে বেশিরভাগ পুকুর হয়তো অনাবাদিই থেকে যাচ্ছে। খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা যেমন বাড়ছে, তেমনি মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই সময়ে দেখা গেল পূর্বের কৃষি উৎপাদনের মূলকেন্দ্র গ্রাম ও গ্রামীণ জনপদের কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে, বা যুগের প্রয়োজনে আধুনিক কৃষির আগমন ঘটে। লাঙ্গলের বদলে আসে কলের লাঙ্গল। গোবরের জৈব সারের বদলে আসে রাসায়নিক সার। স্থানীয় জাতের জায়গায় দখল নেয় হাইব্রিড জাত। ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ঐতিহ্যবাহী জাত বিলুপ্ত হতে থাকে। কৃষকের বীজের স্বনির্ভরতা চলে যায় কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণে। মাটির উর্বরতা কমে, উপকারী পোকামাকড় হারিয়ে যায়। উৎপাদন বাড়লেও খাদ্য অনিরাপদ হতে থাকে। মাছে ফরমালিন, মুরগিতে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার, পানিতে হেভি মেটাল, দুধে ভেজাল, মাংসে স্টেরয়েড, শাকসবজিতে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, এসব আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবতা।

অতিরিক্ত মুনাফার লোভে মানবিকতা বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহার করেই আবার দ্রুত ফসল বাজারজাত করা হচ্ছে। নদীতে কীটনাশক ছিটিয়ে মাছ ধরা হচ্ছে। শুটকি উৎপাদনেও মারাত্মক ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে খাদ্য শুধু অনিরাপদই হচ্ছে না, বরং পরিবেশ ও মাটির উর্বরতাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে জনস্বাস্থ্যে। আমরা ক্রমশ একটি অসুস্থ জাতিতে পরিণত হচ্ছি, যেখানে খাদ্যই হয়ে উঠছে রোগের উৎস। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে দেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আবাদি জমির উপরিভাগের উর্বরতা ও অণুজীবের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটি একটি নীরব সংকট, যা আমরা প্রায়ই উপেক্ষা করি।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করতে আমাদের খুব বেশি দূরে যেতে হয় না। মাত্র কয়েক বছর আগেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ মহামারী আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষির বিকল্প নেই। মহামারীর সময় বিশ্ব অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। উন্নত দেশগুলো পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, আর এর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল দেশের কৃষি খাতের। এই অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে, যেকোনো বৈশ্বিক সংকটে টিকে থাকার জন্য একটি শক্তিশালী কৃষি ব্যবস্থা অপরিহার্য। শিল্প-কারখানা বন্ধ, কর্মসংস্থান সীমিত এবং শহরমুখী মানুষের আয় কমে যাওয়ার সময় গ্রামের কৃষকরা মাঠে কাজ চালিয়ে গেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। ধান, গম, শাকসবজি, ফলমূল উৎপাদন অব্যাহত ছিল বলেই দেশের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। মহামারীর সময়ে শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসা বহু মানুষ কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে জীবিকার নতুন পথ খুঁজে পান।

ফলে কৃষি শুধু খাদ্য জোগানই দেয়নি, বরং বিকল্প কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই সময় কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ, যেমন সবজি চাষ, পোল্ট্রি, মৎস্যচাষ ইত্যাদি মানুষের জীবিকা টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করেছে।

এরপরই বিশ্বকে নাড়িয়ে দেয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইউক্রেন ও রাশিয়া বিশ্বে গম, ভুট্টা ও সূর্যমুখী তেলের অন্যতম বড় রপ্তানিকারক দেশ হওয়ায় যুদ্ধের কারণে এসব পণ্যের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর দেশে। বাংলাদেশে গম, ভোজ্যতেল ও পশুখাদ্যের কাঁচামালের একটি বড় অংশ আমদানির ওপর নির্ভরশীল। ফলে এই যুদ্ধের কারণে আমদানি ব্যয় বেড়ে যায়, যা দেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতিকে ত্বরান্বিত করে। এই

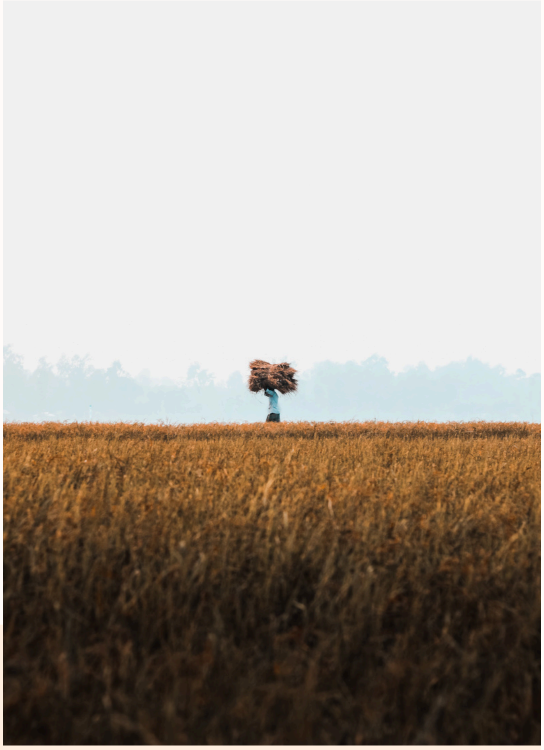

পরিস্থিতি আমাদের আবারও মনে করিয়ে দেয়, কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং উৎপাদন বহুমুখীকরণের কোনো বিকল্প নেই।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা, বিশেষ করে সম্ভাব্য ইরান - যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা, জ্বালানি বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে কৃষি উৎপাদনের খরচও বেড়ে যায়, কারণ সেচ, পরিবহন ও সার উৎপাদনের সঙ্গে জ্বালানি সরাসরি সম্পর্কিত। ফলে কৃষি খাত নতুন করে চাপের মুখে পড়ে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তবতা আমাদের একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়, কৃষি শুধু একটি খাত নয়, এটি জাতীয় নিরাপত্তার মূল স্তম্ভ। এই বাস্তবতায় আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। প্রতিটি মানুষকে কৃষির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে?

যার বসতবাড়িতে একটুকরো পতিত জমি আছে, সেটিকে সারাবছরের কৃষি উৎপাদনের আওতায় আনা যেতে পারে। কালিকাপুর মডেল অনুসরণ করে বছরব্যাপী শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে একটি পরিবার নিজের নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারে। যাদের বাড়িতে জমি নেই, কিন্তু ছাদ আছে, তারা ছাদ কৃষির মাধ্যমে সারা বছর সবজি উৎপাদনের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন। যাদের পুকুর রয়েছে, তারা মৎস্য চাষের পাশাপাশি পাড়ে সবজি চাষ করে উৎপাদন বাড়াতে পারেন। যাদের একেবারেই জায়গা নেই, তারাও বস্তায় মাটি ও জৈবসার ব্যবহার করে অল্প পরিসরে সবজি চাষ শুরু করতে পারেন। পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি বা কোয়েল পালন করা যেতে পারে। শহরের বাসায় ছোট একটি বারান্দা থাকলেও খাঁচায় মুরগি বা কোয়েল পালন করে পরিবারের ডিমের চাহিদার একটি অংশ পূরণ সম্ভব। ছোট ছোট উদ্যোগই একসময় বড় পরিবর্তনের ভিত্তি গড়ে তোলে।

আমরা এমন এক বিশ্বের দিকে এগোচ্ছি, যেখানে অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু খাদ্যের নিশ্চয়তা নাও থাকতে পারে। সেই সময় সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে তারা, যারা নিজের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করতে পারবে।

কৃষি আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের শক্তি, আমাদের ভবিষ্যৎ। এই খাতকে নতুন করে মূল্যায়ন করতে হবে, সম্মান দিতে হবে। সময় এসেছে একটি সম্মিলিত উদ্যোগ গড়ে তোলার।

যেখানে সকল শ্রেণী-পেশার, সকল বয়সের মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত হবে। একটি বীজ রোপণের সুযোগ থাকলেও তা হাতছাড়া করা উচিত নয়। কারণ কৃষি বাঁচলে দেশ বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে।

তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি শপথ গ্রহণ করি: সবার জন্য চাষাবাদ।

লেখকঃ
প্রধান নির্বাহী, সেভ দ্য ফার্মার বাংলাদেশ

পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ও কৃষিপণ্যের গুণাগুণ: একটি সমন্বিত বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

অনু চিছাম

খাদ্য আজ শুধু ক্ষুধা নিবারণের বিষয় নয়; এটি জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও টেকসই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। আমরা প্রতিদিন যে খাদ্য গ্রহণ করি, তার মান, নিরাপত্তা ও পুষ্টিগুণ সরাসরি আমাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর প্রভাব ফেলে। তাই বাংলাদেশের মতো কৃষিনির্ভর দেশে পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষিপণ্যের গুণাগুণ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কেননা "পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ও কৃষিপণ্যের গুণাগুণ" এই তিনটি বিষয়কে আলাদা করে দেখা যায় না; বরং এগুলো একটি একক খাদ্যব্যবস্থার (food system) অবিচ্ছেদ্য তিনটি স্তম্ভ।

পুষ্টি: কেবল ক্যালরি নয়, কার্যকর জীবনশক্তি

পুষ্টি হলো এমন একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে খাদ্য শরীরকে শক্তি জোগায়, বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় পুষ্টির সমস্যা অনেক সময় ক্যালরির ঘাটতি নয়, বরং "লুকায়িত অপুষ্টি"—যেখানে মানুষ পর্যাপ্ত খাবার খেলেও প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পায় না। যেমন, নিয়মিত ভাত ও আলু খেয়েও একজন ব্যক্তি আয়রন বা ভিটামিন এ-এর ঘাটতিতে ভুগতে পারেন, যা শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত করে এবং রোগপ্রবণতা বাড়ায়।

পুষ্টির অভাবে শিশুদের খর্বকায় ও স্থূলতা উভয় ধরনের সমস্যা দেখা যায়, তাছাড়া গর্ভবতী মায়েদের অপুষ্টিজনিত নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। এর প্রধান কারণ হলো অধিকাংশ মানুষের খাদ্যতালিকায় শর্করার আধিক্য (ভাতনির্ভর খাদ্যাভ্যাস), প্রাণিজ প্রোটিন ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি এবং অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত (processed) খাদ্যের প্রতি ঝোঁক।
তাই পুষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সরাসরি জনস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। এর সমাধান হলো খাদ্যে বৈচিত্র্য আনা; শাকসবজি, ডাল, মাছ, ডিম ও ফলমূল নিয়মিত গ্রহণ করা, পাশাপাশি পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা।

নিরাপদ খাদ্য: স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলিক শর্ত

নিরাপদ খাদ্য বলতে এমন খাদ্যকে বোঝায় যা জীবাণু, রাসায়নিক ও ভৌত দূষণমুক্ত এবং মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে খাদ্যে ভেজাল, কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ এবং অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়াজাতকরণের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, বাজারে ফরমালিনযুক্ত মাছ বা অতিরিক্ত কীটনাশকযুক্ত সবজি পাওয়া গেলে তা দীর্ঘমেয়াদে কিডনি ক্ষতি বা ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে তিনটি প্রধান ঝুঁকি বিবেচ্য—

ক. জীবাণুজনিত (biological hazards)

স্যালমোনেলা, ই. কোলাই, লিস্টেরিয়া প্রভৃতি খাদ্যবাহিত রোগের প্রধান কারণ। অপর্যাপ্ত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ক্রস-কন্টামিনেশন এর বড় কারণ।

খ. রাসায়নিক (chemical hazards)

খাদ্যে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, ভারী ধাতু (lead, arsenic, cadmium, chromium) ইত্যাদি রাসায়নিক ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এগুলো দীর্ঘমেয়াদে শরীরের গুরুতর ক্ষতি করতে পারে। এর সমাধান হলো সঠিক কৃষি অনুশীলন, নিয়মিত ল্যাব পরীক্ষা, বাজার তদারকি এবং কঠোরভাবে খাদ্য নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন।

গ. ভৌত (physical hazards)

খাদ্যে কাচ, ধাতু, প্লাস্টিক, পাথর, মাটি, চুল, নখ বা পোকামাকড়ের অংশ অনিচ্ছাকৃতভাবে মিশে গেলে তা ভৌত ঝুঁকি তৈরি করে। তাই "খামার থেকে খাবার টেবিল" পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে মান নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

কৃষিপণ্যের গুণাগুণ: উৎপাদন থেকে পুষ্টির যাত্রা

কৃষিপণ্যের গুণাগুণ বলতে খাদ্যের পুষ্টিমান, সতেজতা ও নিরাপত্তার সামগ্রিক মানকে বোঝায়, যা উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রতিটি ধাপে নির্ধারিত হয়।

“লুকায়িত অপুষ্টি এমন এক বাস্তবতা, যেখানে পর্যাপ্ত খাবার থেকেও মানুষ প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়।”

এর গুণাগুণ নির্ভর করে মাটি, পানি, আবহাওয়া, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার উপর এবং এটি তিনটি স্তরে নির্ধারিত—

ক. প্রাক-উৎপাদন (pre-harvest factors)

- মাটির উর্বরতা
- পানির গুণগত মান
- বীজের গুণগত মান
- সুষম সার প্রয়োগ

উদাহরণস্বরূপ, জিঙ্কসমৃদ্ধ মাটিতে উৎপাদিত ধান মানুষের জিঙ্ক ঘাটতি কমাতে সহায়ক।

খ. উৎপাদন ও সংগ্রহ (harvesting stage)

- সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহ না করলে পুষ্টিগুণ কমে যায়
- অপরিপক্ক বা অতিপক্ক ফসল গুণগত মান হারায়

গ. পর-উৎপাদন (post-harvest management)

- সংরক্ষণ তাপমাত্রা
- আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ
- পরিবহন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে post-harvest loss এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ, যা অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি পুষ্টিগত নিরাপত্তার জন্যও হুমকি।

গুণমান বনাম উৎপাদন: একটি বাস্তব দ্বন্দ্ব

অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে অনেক সময় কৃষিপণ্যের গুণাগুণ ও নিরাপত্তা উপেক্ষিত হয়। অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহারে স্বল্পমেয়াদে ফলন বাড়লেও দীর্ঘমেয়াদে মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং খাদ্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তাই উৎপাদন ও গুণমানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য Good Agricultural Practices (GAP) এবং Integrated Pest Management (IPM) অনুসরণ করা প্রয়োজন।

ভোক্তা সচেতনতা: শেষ কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ

ভোক্তার সচেতনতার অভাবে নিরাপদ খাদ্যও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কাঁচা ও রান্না করা খাবারের জন্য আলাদা সরঞ্জাম ব্যবহার না করা, বা রান্না করা খাবার দীর্ঘসময় বাইরে রেখে দেওয়া খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

তাই খাদ্য ভালোভাবে ধোয়া, কাঁচা ও রান্না করা খাবার আলাদা রাখা এবং সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস।

সমন্বিত পথরেখা

পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ও কৃষিপণ্যের গুণাগুণ উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। এজন্য ল্যাবরেটরি সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার থেকে বাজার পর্যন্ত ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থা চালু, কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং খাদ্য নিরাপত্তা নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ও কৃষিপণ্যের গুণাগুণ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাই শুধু “কি খাচ্ছি” নয়, বরং “কোথা থেকে আসছে, কিভাবে উৎপাদিত হচ্ছে এবং কতটা নিরাপদ”- এই সচেতনতা তৈরি করতে পারলেই একটি টেকসই, পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

লেখকঃ

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা (সংযুক্ত), উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরি, কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউস, শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪

গ্রীষ্মকালে ছাদ কৃষি: শহুরে জীবনে স্মার্ট কৃষির নতুন দিগন্ত

সালাহ্ উদ্দিন

বাংলাদেশে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস মানেই তীব্র গরম, অনিয়মিত বৃষ্টি এবং খরার আশঙ্কা। এই সময়টিতে কৃষি ব্যবস্থাপনা যেমন চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে, তেমনি শহুরে কৃষিতেও প্রয়োজন হয় বিশেষ পরিকল্পনা ও যত্ন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, কৃষিজমি হ্রাস এবং নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ছাদ কৃষি এখন শহরের মানুষের জন্য একটি কার্যকর ও সময়োপযোগী সমাধান হিসেবে উঠে এসেছে।

বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠে ছাদ কৃষির প্রধান চ্যালেঞ্জ

এই সময়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো অতিরিক্ত তাপমাত্রা, দ্রুত মাটির আর্দ্রতা হ্রাস এবং গাছের ওপর সরাসরি সূর্যালোকের চাপ। এর ফলে পাতা ঝলসে যাওয়া, ফুল ও ফল ঝরে পড়া এবং গাছ দুর্বল হয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই ছাদ কৃষিতে এ সময় বিশেষ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য।

গ্রীষ্মকালীন ছাদ কৃষি ব্যবস্থাপনা

পানি ব্যবস্থাপনা

গ্রীষ্মকালে গাছ দ্রুত পানিশূন্য হয়ে পড়ে। তাই প্রতিদিন সকাল বা বিকেলে নিয়মিত সেচ দেওয়া প্রয়োজন। দুপুরের তীব্র রোদে পানি দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা থাকলে তা সবচেয়ে কার্যকর ও পানি সাশ্রয়ী পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ছায়া ও তাপ নিয়ন্ত্রণ

অতিরিক্ত রোদ থেকে গাছকে রক্ষা করতে শেড নেট বা অস্থায়ী ছাউনি ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে নতুন চারা গাছ সরাসরি রোদে রাখা উচিত নয়।

মালচিং প্রযুক্তি

মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে শুকনো পাতা, খড়, কোকোপিট বা জৈব পদার্থ দিয়ে মালচিং করা অত্যন্ত কার্যকর। এতে মাটি দীর্ঘ সময় ঠান্ডা ও আর্দ্র থাকে এবং পানির ব্যবহার কমে যায়।

জৈব সার ব্যবস্থাপনা

প্রতি ১০ থেকে ১৫ দিন পর পর তরল জৈব সার ব্যবহার করলে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং বৃদ্ধি ভালো হয়। তবে অতিরিক্ত সার প্রয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত।

উপযোগী গ্রীষ্মকালীন ফসল

বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠে ছাদ কৃষির জন্য ঢেঁড়স, পুঁইশাক, লালশাক, ডাঁটা শাক, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙা, বেগুন, মরিচসহ বিভিন্ন লতানো সবজি উপযোগী। পাশাপাশি টবে পেঁপে, লেবু ও কলমজাত আমের গাছও সফলভাবে চাষ করা সম্ভব।

বর্ষার পূর্ব প্রস্তুতি ও পরিচর্যা

গ্রীষ্মের শেষ দিকে বর্ষা শুরু হলে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও পানি জমে থাকা ছাদ কৃষির জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করে। তাই আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি।

পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা

টব বা বেডে পর্যাপ্ত ড্রেনেজ নিশ্চিত করতে হবে। পানি যেন কোনো অবস্থাতেই জমে না থাকে তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

অতিরিক্ত বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা

ভারী বৃষ্টির সময় শেড বা কভার ব্যবহার করে গাছ রক্ষা করা যেতে পারে। ছোট ও সংবেদনশীল গাছগুলোকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখা উত্তম।

রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ

বর্ষাকালে ছত্রাকজনিত রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জৈব বালাইনাশক বা নিম-ভিত্তিক সমাধান ব্যবহার করা যেতে পারে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণ

আর্দ্র পরিবেশে আগাছা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করে গাছের পুষ্টি নিশ্চিত করা জরুরি।

শহুরে কৃষির বাস্তব সম্ভাবনা

স্মার্ট ফার্মিং পদ্ধতি ছাদ কৃষিকে আরও আধুনিক করে তুলছে। মাটির আর্দ্রতা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় সেচ ব্যবস্থা, রোগ শনাক্তে মোবাইল অ্যাপ, আবহাওয়া পূর্বাভাসভিত্তিক পরিচর্যা—এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি এখন অনেকটাই বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠেছে। এতে উৎপাদন ঝুঁকি কমে এবং ফলন বাড়ে।

ছাদ কৃষির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন। নিজস্ব ছাদে উৎপাদিত সবজি ও ফল রাসায়নিকমুক্ত হওয়ায় তা পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর। একই সঙ্গে এটি শহরের তাপমাত্রা কমাতে, বায়ুদূষণ হ্রাস করতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

ছাদ কৃষি এখন আর শুধু শখের বিষয় নয়, বরং এটি শহরের খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশ সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটি সুপরিকল্পিত ছাদ বাগান পরিবারকে নিরাপদ সবজি সরবরাহের পাশাপাশি শহরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বায়ুদূষণ হ্রাস এবং মানসিক প্রশান্তি প্রদান করতে পারে।

সঠিক পরিকল্পনা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং মৌসুমভিত্তিক পরিচর্যা নিশ্চিত করা গেলে বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠের কঠিন আবহাওয়াও ছাদ কৃষির জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বরং এটি শহুরে সবুজায়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে।

ছাদ কৃষির সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো সচেতনতা, নিয়মিত পরিচর্যা এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা। এই তিনটি বিষয় নিশ্চিত করা গেলে শহরের প্রতিটি ছাদই হয়ে উঠতে পারে একটি নিরাপদ, টেকসই ও উৎপাদনশীল খাদ্য উৎস।

পরিকল্পিতভাবে ছাদ কৃষি সম্প্রসারণ করা গেলে শহরের খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। প্রতিটি ভবনের ছাদ যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে নগর এলাকায় একটি ছোট কিন্তু কার্যকর কৃষি বিপ্লব ঘটানো সম্ভব।

লেখকঃ
সালাহ্ উদ্দিন, ফাউন্ডার, প্লান্টস কেয়ার (*Plants Care*)

জৈবিক ও পরিবেশসম্মত ভাবে গ্রীষ্মকালীন বিভিন্ন ফসলের ইঁদুর ব্যবস্থাপনা

অধ্যাপক ড. মো. শামীম হোসেন নোমান

মাঠ ফসল ও গুদামজাত শস্যে ইঁদুরের উপদ্রব প্রতিনিয়ত দেখা যায়। বিশ্বের অনিষ্টকারী প্রাণীদের মধ্যে ইঁদুরের অবস্থান সর্বাগ্রে। বাংলাদেশে ২২ টিরও অধিক ক্ষতিকারক ইঁদুর জাতীয় প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। এরা প্রধানত ধান, গম, ভুট্টা, আখ, বাদাম, নারিকেল এবং বিভিন্ন সবজি ফসল যেমন আলু, মিষ্টি আলু ইত্যাদিতে আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ইঁদুর এমন এক ক্ষতিকর প্রাণী, যা ফসল বপন থেকে শুরু করে কাটা ও সংরক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে ক্ষতি করে। ইঁদুর যে পরিমাণ খায়, তার দ্বিগুণ নষ্ট করে—এই কারণেই একে অনিষ্টকর প্রাণী বলা হয়। বাংলাদেশে ইঁদুরের আক্রমণে বছরে আমন ধানের ৫–৭%, গমের ৪–১২%, আলুর ৫–৭%, আনারসের ৫–৯% এবং গড়ে মাঠ ফসলের ৫–৭% ক্ষতি হয়ে থাকে।

বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে ইঁদুর দমন ব্যবস্থার সময় ভিন্ন ভিন্ন। যেমন—ধানের ক্ষেত্রে বীজতলা থেকে থোড় আসার আগ পর্যন্ত, গমে থোড় হওয়ার আগে, আখে চারা রোপণের আগে, নারিকেলে ফল ধরার আগে থেকে সংগ্রহ পর্যন্ত এবং সবজি, বাদাম ও আলুতে চারা রোপণ থেকে ফল ধরা পর্যন্ত দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
ইঁদুর দমনে যান্ত্রিক, জৈবিক এবং রাসায়নিক—সবধরনের পদ্ধতি রয়েছে। তবে রাসায়নিক পদ্ধতির নানা ক্ষতিকর দিক আছে, যেমন—উপকারী প্রাণীর ক্ষতি ও পরিবেশ দূষণ। তাই জৈবিক ও পরিবেশ সম্মত পদ্ধতির ব্যবহার উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

১. জৈবিক পদ্ধতি

শিকারী প্রাণীর ব্যবহার:

পরিবেশ বান্ধব দমনের জন্য প্রাকৃতিক শিকারী প্রাণীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিবাচর পাখি যেমন ঈগল, তিলাবাজ, চিল এবং নিশাচর পাখি যেমন লক্ষ্মী পেঁচা, ব্রাউন হক-আওল; স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন বনবিড়াল, মেছোবিড়াল, শিয়াল, বেজি; সরীসৃপ যেমন সাপ ও গুইসাপ—এরা প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ইঁদুর শিকার করে। একটি লক্ষ্মী পেঁচা প্রতি রাতে গড়ে ১–৬ টি ইঁদুর ধরে। কিন্তু অবাধ শিকার ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে এসব উপকারী প্রাণীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তাই এদের সংরক্ষণ জরুরি। ক্ষেতের মধ্যে পাখি বসার ডাল পুঁতে দিলে শিকার সহজ হয়।

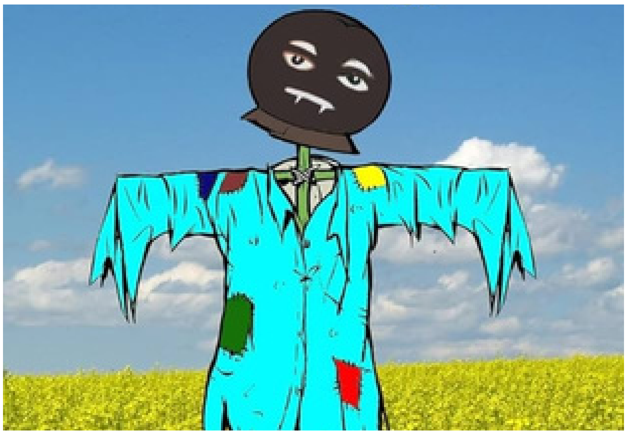

পরজীবী প্রাণীর ব্যবহার:
বিভিন্ন অণুজীব ও পরজীবী ইঁদুর দমনে কার্যকর হতে পারে। তবে মানুষ ও গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে এদের ব্যবহার সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে।

২. যান্ত্রিক পদ্ধতি

ফাঁদ ব্যবহার:
বাঁশ, কাঠ, টিন বা লোহার তৈরি ফাঁদ ব্যবহার করে কার্যকর ভাবে ইঁদুর দমন করা যায়। ইঁদুরের চলাচলের পথে ফাঁদ বসাতে হবে এবং নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে।

আঠাযুক্ত বোর্ড:
আঠা লাগানো বোর্ডে খাবারের টোপ দিয়ে ইঁদুর ধরার ব্যবস্থা করা যায়।

আল্ট্রাসনিক বা ইলেকট্রিক যন্ত্র:
আল্ট্রাসনিক শব্দ নির্গতকারী যন্ত্র ইঁদুর দূরে রাখতে সাহায্য করে, আর ইলেকট্রিক ট্র্যাপ ইঁদুর নিধনে কার্যকর।

৩. চাষাবাদ পদ্ধতি

গভীর চাষ, আইল ছোটরাখা, আগাছা পরিষ্কার এবং ইঁদুরের গর্ত ধ্বংস করলে ইঁদুরের বসবাস কমে যায়।

৪. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

বাড়ি, গুদাম, ক্ষেতের চারপাশ পরিষ্কার রাখা, ঝোপঝাড় অপসারণ এবং খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে ইঁদুরের আক্রমণ কমে।

৫. শস্যাবর্তন

একই ফসল বারবার চাষ করলে ইঁদুরের বিস্তার বাড়ে। শস্য পরিবর্তন করলে তাদের জীবনচক্র ব্যাহত হয়।

৬. ফাঁদ ফসল পদ্ধতি

মূল ফসলের সঙ্গে আকর্ষণীয় ফাঁদ ফসল লাগিয়ে ইঁদুরকে আকৃষ্ট করে ফাঁদে ধরা যায়।

৭. প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

পলিথিন, টিন বা তারের জালি ব্যবহার করে জমি বা গুদাম ঘিরে ইঁদুর প্রবেশ বন্ধ করা যায়। ফল গাছে টিনের বেষ্টনী দিলে গাছে ওঠা রোধ করা যায়।

৮. পানি ও ধোঁয়াব্যবহার

ইঁদুরের গর্তে পানি বা ধোঁয়া প্রয়োগ করে ইঁদুর বের করে ধ্বংস করা যায়।

৯. পলিথিনের ঝান্ডা ও রিবন

বাতাসে শব্দ সৃষ্টি করে ইঁদুরকে দূরে রাখে।

১০. কাকতাড়ুয়া

দেশীয় এই পদ্ধতি এখনো কার্যকর এবং সাংস্কৃতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ।

ইঁদুর দমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া। শুধুমাত্র একটি পদ্ধতির ওপর নির্ভর না করে জৈবিক, যান্ত্রিক ও পরিবেশসম্মত পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই ও নিরাপদ কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

লেখকঃ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক।

নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও প্রজন্ম ভাবনা

মো. তাজ উদ্দিন সম্রাট

নিরাপদ ও টেকসই কৃষির পথে প্রজন্মের অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও পরিবেশবান্ধব চর্চাই ভবিষ্যতের মূল চাবিকাঠি

বর্তমান সময়ে কৃষি আর শুধু ক্ষুধা নিবারণের ক্ষেত্র নয়; এটি এখন পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। আমরা যেভাবে অযথা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছি, তাতে মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে, পানি দূষিত হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পড়ছে। এক কথায়, আমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ডেকে আনছি। তাই এখন সময় থেমে চিন্তা করার, বাস্তবতা বোঝার এবং পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি নিরাপদ ফসল উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার।

কিন্তু শুধু এগিয়ে যেতে চাইলেই তা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও কার্যকর কর্মপদ্ধতি, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অ্যাকশন প্ল্যান।

প্রথমত, এই খাতে শিক্ষিত যুবসমাজ ও তরুণদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এখনো অনেকেই মনে করেন কৃষি মানে কষ্টের কাজ, যেখানে লাভের সম্ভাবনা কম; অনেকে এটিকে একটি "লস প্রজেক্ট" হিসেবে দেখেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখানেই ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং সরকারি সহায়তা পেলে তরুণরা এই খাতকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারে।

সরকার যদি উদ্যোক্তা তৈরির দিকে মনোযোগ দেয়, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করে, তাহলে অনেক তরুণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষিতে যুক্ত হবে। তখন কৃষি আর পিছিয়ে থাকা পেশা নয়, বরং সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ কৃষকদের আরও সচেতন করা জরুরি। অনেক সময় তারা অধিক ফলনের আশায় অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন, যা স্বল্পমেয়াদে লাভ দিলেও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে তাদের বোঝাতে হবে—কম ইনপুটে কীভাবে বেশি লাভ করা যায়। জৈব সার, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) সঠিকভাবে ব্যবহার করলে ফসলের উৎপাদন ভালো হয় এবং পরিবেশও সুরক্ষিত থাকে। এ ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে আরও কার্যকর

ও বাস্তবভিত্তিক ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, শুধু নিরাপদ ফসল উৎপাদন করলেই হবে না; নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে ভোক্তাদেরও সচেতন করতে হবে। আমরা যদি নিজেরাই নিরাপদ খাদ্যের যথাযথ মূল্য না দিই, তাহলে কৃষকরা নিরাপদ উৎপাদনে আগ্রহী হবে না। তাই জনগণকে বোঝাতে হবে—ভালো ও নিরাপদ খাবারের জন্য সামান্য বেশি মূল্য দেওয়া কোনো ক্ষতি নয়, বরং এটি নিজের স্বাস্থ্যের জন্য একটি বিনিয়োগ। শাকসবজি, মাছসহ প্রতিটি খাদ্যদ্রব্য নিরাপদভাবে গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনগুলোর সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সবশেষে বলা যায়, এই দায়িত্ব এককভাবে কারও নয়। সরকার, কৃষক, তরুণ সমাজ এবং সাধারণ জনগণ—সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। সঠিক পরিকল্পনা, আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে আমরা একটি নিরাপদ, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব। শেষ কথা, মাটি বাঁচলে কৃষি বাঁচবে, আর পরিবেশ বাঁচলে মানুষ বাঁচবে—এই উপলব্ধিই এখন সময়ের সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

লেখক:
প্রতিষ্ঠাতা ও কৌশলগত পরামর্শক
নববাংলা উন্নয়ন কর্মসূচি, বাংলাদেশ

- কৃষি এখন পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত
- অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার ক্ষতিকর
- নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সচেতনতা ও পরিকল্পনা জরুরি
- তরুণদের সম্পৃক্ততা কৃষির ভবিষ্যৎ
- জৈব পদ্ধতি ও IPM কার্যকর সমাধান

বাংলাদেশের ফল রপ্তানির সম্ভাবনা

এমরান আহমেদ

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ, যেখানে অধিকাংশ মানুষ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, উর্বর পলিমাটি, উপযুক্ত জলবায়ু এবং মৌসুমি বৈচিত্র্য ফল চাষের জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এ দেশে সারা বছর বিভিন্ন মৌসুমে নানা ধরনের ফল উৎপাদিত হয়, যা শুধু দেশের চাহিদা পূরণ করে না, বরং বিদেশে রপ্তানিরও বিপুল সম্ভাবনা তৈরি করে। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে কৃষিপণ্য, বিশেষ করে ফল রপ্তানি, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কলা, আনারস, পেঁপে, তরমুজ, মাল্টা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে আমকে “ফলের রাজা” বলা হয় এবং বাংলাদেশের আমের স্বাদ ও গুণগত মান বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও দিনাজপুরের আম আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষভাবে সমাদৃত হতে পারে।

তেমনি, নাটোর ও দিনাজপুরের লিচু, পার্বত্য চট্টগ্রামের আনারস, বরিশালের পেয়ারা ইত্যাদি ফলের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা বিদেশি বাজারে আলাদা পরিচিতি তৈরি করতে সক্ষম।

বিশ্বাবজারে বর্তমানে স্বাস্থ্যসচেতনতার কারণে প্রাকৃতিক ও অর্গানিক ফলের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক উন্নত দেশে রাসায়নিকমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। বাংলাদেশে এখনও অনেক কৃষক তুলনামূলকভাবে কম রাসায়নিক ব্যবহার করে ফল উৎপাদন করেন, যা আন্তর্জাতিক বাজারে একটি বড় সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সঠিক মান নিয়ন্ত্রণ, গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (GAP) অনুসরণ এবং আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশের ফল সহজেই বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ করতে পারবে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশে সীমিত পরিসরে ফল রপ্তানি করছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের কারণে এসব দেশে দেশীয় ফলের একটি নির্দিষ্ট চাহিদা রয়েছে। এ চাহিদাকে কেন্দ্র করে রপ্তানির পরিমাণ আরও বাড়ানো সম্ভব। পাশাপাশি বিদেশিদের মধ্যেও বাংলাদেশের ফলের স্বাদ ও গুণগত মান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা গেলে নতুন বাজার সৃষ্টি হবে।

ফল রপ্তানির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বড় অংশ তৈরি পোশাক শিল্প থেকে আসে। তবে একক খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা অর্থনীতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাই কৃষিপণ্য, বিশেষ করে ফল রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি খাতের বহুমুখীকরণ

অত্যন্ত জরুরি। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে।

তবে বাংলাদেশের ফল রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। **প্রথমত,** ফল সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ সুবিধার অভাব রয়েছে। ফলে অনেক ফল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং রপ্তানিযোগ্য থাকে না। **দ্বিতীয়ত,** আধুনিক প্যাকেজিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাব আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেয়। **তৃতীয়ত,** পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা, বিশেষ করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন না থাকায় ফলের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়া আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, স্বাস্থ্যবিধি এবং ফাইটোস্যানিটারি (Sanitary and Phytosanitary) নিয়ম সম্পর্কে অনেক কৃষক ও রপ্তানিকারকের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই।

ফলে অনেক সময় রপ্তানি পণ্য বিদেশে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। বাজারসংযোগের অভাব, পর্যাপ্ত গবেষণা ও উন্নয়নের ঘাটতি এবং সরকারি নীতিমালার জটিলতাও রপ্তানি বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সরকারকে আধুনিক কোল্ড চেইন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত ফলের গুণগত মান অক্ষুণ্ন থাকে। কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলা জরুরি।

বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ও অংশগ্রহণ বাড়ানোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে সহজ ঋণ, ভর্তুকি এবং কর-সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশের ফলের ব্র্যান্ডিং ও বিপণন জোরদার করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, অনলাইন মার্কেটপ্লেস এবং কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে নতুন বাজার খুঁজে বের করা সম্ভব। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারও ফল রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন মার্কেটিং এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষক ও রপ্তানিকারকদের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতে করে বাজার তথ্য সহজলভ্য হবে এবং উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতা বাড়বে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের ফল রপ্তানির ব্যাপক সম্ভাবনা আছে, এখন প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা ও দৃঢ় বাস্তবায়ন। সঠিক পরিকল্পনা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, মান নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যকর নীতিমালার মাধ্যমে এই খাতকে একটি শক্তিশালী রপ্তানি খাতে পরিণত করা সম্ভব। এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তাই এখনই সময় ফল রপ্তানির এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ববাজারে একটি শক্ত অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার।

পলিশেডে উচ্চমূল্যের ফসল চাষ: কক্সবাজারের কৃষক শফি আলমের সফলতা

- কক্সবাজারে ইউভি পলিশেডে উচ্চমূল্যের সবজি চাষে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছেন কৃষক শফি আলম
- মাত্র ২০ শতক জমিতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করে অল্প সময়েই আয় প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা
- জৈব সার ও মালচিং প্রযুক্তি ব্যবহারে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সফলতা
- স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি হোটেল-রেস্টুরেন্টে সরবরাহ করে বাড়ছে আয়
- শফি আলমের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন এলাকার অন্যান্য কৃষকরাও

কক্সবাজারের রামু উপজেলার দক্ষিণ খুনিয়াপালংয়ে ইউভি পলিশেড হাউসে উচ্চমূল্যের সবজি চাষে সফল কৃষক মো. শফি আলমের ক্ষেত।

কক্সবাজারের রামু উপজেলার খুনিয়াপালং ইউনিয়নের দক্ষিণ খুনিয়াপালং গ্রামের কৃষক মো. শফি আলম একসময় পান চাষ ও প্রচলিত সবজি আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু এসব চাষাবাদ থেকে আশানুরূপ লাভ না হওয়ায় পরিবার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল তাকে। সীমিত আয়ে জীবনের চাকা সচল রাখা ছিল কঠিন।

পরবর্তীতে উন্নয়ন সংস্থা 'শুশীলন' ও 'ভিএসও বাংলাদেশ'-এর সহযোগিতায় তিনি আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হন। তাদের পরামর্শে ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে ২০ শতক জমিতে ইউভি পলিশেড হাউসের মাধ্যমে উচ্চমূল্যের সবজি চাষ শুরু করেন।

প্রথম পর্যায়ে তাকে ক্যাপসিকাম, লেটুস, ব্রকলি, স্কোয়াশ ও শসাসহ বিভিন্ন উচ্চমূল্যের সবজির বীজ সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি আধুনিক চাষাবাদ কৌশল যেমন জৈব সার (ভার্মি কম্পোস্ট) ব্যবহার, মালচিং প্রযুক্তি প্রয়োগসহ পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে কৃষি ও কৃষকের পাশে দাঁড়ানোই এখন সময়ের দাবি। কারণ, কৃষক বাঁচলে তবেই বাঁচবে দেশ। Save the Farmer BD

এই নতুন পদ্ধতি দ্রুতই তার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি উচ্চমূল্যের সবজি উৎপাদন করে প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা আয় করতে সক্ষম হন। যা তার আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

বর্তমানে শফি আলম ক্যাপসিকাম, লেটুস, ব্রকলি, স্কোয়াশ, শসা, শালগম ও আলুসহ বিভিন্ন উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন করছেন। উৎপাদিত পণ্য তিনি উখিয়া, কোর্ট বাজার, তুলাবাগান ও কক্সবাজারের বিভিন্ন পাইকারি বাজারে বিক্রি করছেন। পাশাপাশি স্থানীয় হোটেল ও রেস্টুরেন্টেও সরবরাহ করছেন।
নিজের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে শফি আলম বলেন, আগে পান ও অন্যান্য সবজি চাষে তেমন লাভ হতো না। পরে প্রকল্পের কর্মকর্তাদের পরামর্শে উচ্চমূল্যের সবজি চাষ শুরু করি। এখন জৈব পদ্ধতিতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করছি এবং ভালো আয় হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এই চাষ করতে চাই।
শফি আলমের এই সফলতা তার এলাকার অন্যান্য কৃষকদের জন্যও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। অনেকেই এখন উচ্চমূল্যের ফসল চাষ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছেন।

এই উদাহরণটি প্রমাণ করে, সঠিক দিকনির্দেশনা, আধুনিক প্রযুক্তি ও আর্থিক সহায়তা পেলে কৃষকরা সহজেই লাভজনক ও টেকসই কৃষির দিকে এগিয়ে যেতে পারেন। দেশের কৃষি খাতে উচ্চমূল্যের ফসল চাষ সম্প্রসারণে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বৈশাখ মাসের কৃষি

বাংলা বছরের সূচনালগ্ন বৈশাখ কৃষির জন্য প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ সময়। তীব্র তাপদাহ ও খরার সম্ভাবনার মধ্যেও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলে ভালো ফলন নিশ্চিত করা সম্ভব।

ধান

বোরো ধানের ক্ষেত্রে দেরিতে রোপণ করা জমিতে চারার বয়স ৫০–৫৫ দিন হলে ইউরিয়ার শেষ কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে অতিরিক্ত প্রয়োগ প্রয়োজন নেই।

থোড় আসার সময় পানির স্তর বাড়াতে হবে এবং দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। মাজরা পোকা, বাদামি গাছ ফড়িংসহ বিভিন্ন পোকা দমনে নিয়মিত জমি পরিদর্শন ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

পাট

তোষা পাট বপনের উপযুক্ত সময় এখন। উন্নত বীজ নির্বাচন ও বীজ শোধন করে বপন করতে হবে। দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী। আগে বোনা পাটে আগাছা পরিষ্কার, চারা পাতলা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে।

শাকসবজি

ঢেঁড়স, পুঁইশাক, করলা, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, বেগুনসহ গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ শুরু করতে হবে। লতানো সবজির জন্য মাচা তৈরি করা জরুরি। কুমড়া জাতীয় ফসলে হাত পরাগায়ন করলে ফলন বাড়ে।

গাছপালা

আম, কাঁঠালসহ ফলদ গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ফলমাছি দমনে বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। নারিকেলসহ বিভিন্ন বৃক্ষের চারা রোপণের প্রস্তুতি নেওয়া উত্তম।

প্রাণিসম্পদ

গরমে মুরগি ও গবাদি পশুর যত্ন বাড়াতে হবে। পর্যাপ্ত পানি, বাতাস চলাচল এবং তাপ কমানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। নিয়মিত টিকাদান জরুরি।

মৎস্য

পুকুর প্রস্তুত করে মাছের পোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়। চুন প্রয়োগ, আগাছা পরিষ্কার ও পানির গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষি

জ্যৈষ্ঠ মাসকে বলা হয় মধুমাস। এ সময় ফলের মৌসুমের পাশাপাশি ফসল সংগ্রহ ও নতুন মৌসুমের প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ সময়।

ধান

বোরো ধান ৮০% পেকে গেলে দ্রুত কেটে মাড়াই ও সংরক্ষণ করতে হবে।

আউশ ধানের বীজ বপন ও চারার পরিচর্যা করতে হবে।

আমন ধানের জন্য বীজতলা তৈরি, অংকুরিত বীজ ব্যবহার এবং আগাম রোপণ করলে বন্যার ঝুঁকি কমে।

পাট

পাটের জমিতে আগাছা পরিষ্কার, চারা পাতলা করা এবং ইউরিয়ার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকা দমনে হাত দিয়ে সংগ্রহ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

শাকসবজি

গ্রীষ্মকালীন সবজির পরিচর্যা জোরদার করতে হবে। লতানো ফসলে মাচা, সেচ ও আগাছা দমন জরুরি। মাছি পোকা ও অন্যান্য পোকা দমনে ফাঁদ ও জৈব পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

বিবিধ ফসল

আদা, হলুদ, মুগডাল চাষ করা যায়। ধৈঞ্চা সবুজ সার হিসেবে মাটিতে মিশিয়ে উর্বরতা বাড়ানো যায়।

গাছপালা

আগামী মৌসুমে বৃক্ষরোপণের জন্য গর্ত তৈরি, সার প্রয়োগ ও চারা নির্বাচন এখনই সম্পন্ন করা উচিত।

প্রাণিসম্পদ

প্রাণিসম্পদের রোগ প্রতিরোধে টিকাদান, কৃমিনাশক প্রয়োগ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে। গরমে অতিরিক্ত যত্ন প্রয়োজন।

মৎস্য

পুকুরে পোনা ছাড়ার পর নিয়মিত খাবার, পানি ব্যবস্থাপনা এবং মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। বন্যার সম্ভাবনা থাকলে পুকুরের পাড় উঁচু করতে হবে।

বৈশাখ প্রস্তুতির মাস, আর জ্যৈষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও সংগ্রহের মাস। এই দুই মাসে সঠিক পরিকল্পনা, সময়মতো সিদ্ধান্ত এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে গ্রীষ্মকালীন কৃষিতে সফলতা অর্জন সম্ভব।

মনে রাখতে হবে -

“সঠিক সময়ে সঠিক পরিচর্যাই কৃষকের সাফল্যের মূলমন্ত্র।”

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসভিত্তিক কৃষক ভাইদের করণীয় নিয়ে লিখেছেন, **মশিউর রহমান সরকার।**

কৃষির প্রাণভোমরা ইউরিয়া: উৎপাদনে স্বনির্ভরতায় বাধা কোথায়?

কারখানাগুলোর সক্ষমতা ৩০ লাখ টন, কিন্তু উৎপাদন মাত্র পাঁচ থেকে আট লাখ টন! কেন এই বিশাল ব্যবধান? প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে বছরের অর্ধেক সময় বন্ধ থাকে আশুগঞ্জ সার কারখানা।

বাংলাদেশের কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এই খাতের উৎপাদনশীলতা অনেকাংশেই নির্ভর করে সারের ওপর, বিশেষ করে ইউরিয়া সারের ওপর। তবে দেশে পর্যাপ্ত উৎপাদন সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইউরিয়া উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন এখনো অধরা রয়ে গেছে। এতে একদিকে বাড়ছে আমদানিনির্ভরতা, অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি।

জাতীয় সংসদে কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ জানিয়েছেন, দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ সার মজুদ রয়েছে, তা দিয়ে আগামী জুন-জুলাই পর্যন্ত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। যদিও এই আশ্বাসে সাময়িক স্বস্তি মিলেছে, তবুও বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট ও মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার কারণে ভবিষ্যৎ সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

এই অচলাবস্থার অন্যতম কারণ হিসেবে গ্যাস সংকটকে দায়ী করা হয়। ইউরিয়া উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল প্রাকৃতিক গ্যাস হলেও সার কারখানাগুলোকে গ্যাস সরবরাহে অগ্রাধিকার কম দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস সরিয়ে নেওয়ায় সার কারখানাগুলো দীর্ঘ সময় বন্ধ রাখতে হয়। এতে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যয়ও বাড়ে। অন্যদিকে, দেশের অধিকাংশ সার কারখানাই পুরোনো প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বেশি এবং গ্যাস অপচয়ও তুলনামূলক বেশি। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী যেখানে কম গ্যাসে বেশি উৎপাদন সম্ভব, সেখানে পুরোনো কারখানাগুলোতে একই পরিমাণ উৎপাদনে অতিরিক্ত গ্যাস ব্যয় হচ্ছে। ফলে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গিয়ে ভর্তুকির চাপও বাড়ছে।

বর্তমানে সরকার প্রতি টন ইউরিয়া সারের জন্য উল্লেখযোগ্য ভর্তুকি প্রদান করছে। উৎপাদন বা আমদানিতে খরচ অনেক বেশি হলেও কৃষকদের কাছে কম দামে সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এই ভর্তুকির বড় অংশ উৎপাদন ব্যবস্থার অদক্ষতার কারণে কার্যকর সুফল দিচ্ছে না।

উৎপাদন ঘাটতির সুযোগে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি এবং অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির অভিযোগও রয়েছে। দেশীয় উৎপাদন শক্তিশালী হলে এ ধরনের অনিয়ম অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও ইউরিয়া সরবরাহ এখন অনিশ্চিত। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম বেড়েছে এবং সরবরাহে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে আমদানিনির্ভর দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বাড়তি ঝুঁকির মুখে পড়ছে। তবে ইতিবাচক দিকও রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার পিএলসি প্রকল্প চালু হলে কম গ্যাসে বেশি উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ধরনের প্রকল্প সম্প্রসারণ করা গেলে দেশের সার উৎপাদনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইউরিয়া খাতে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা, পুরোনো কারখানার আধুনিকায়ন, অকার্যকর ইউনিট প্রতিস্থাপন এবং উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ বাড়ানো।

সংশ্লিষ্টদের মতে, কৃষিকে টেকসই ও শক্তিশালী করতে হলে সারের মতো মৌলিক উপকরণে স্বনির্ভরতা অর্জন অপরিহার্য। তা না হলে বৈশ্বিক অস্থিরতার প্রভাব থেকে কৃষি খাতকে সুরক্ষা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

চলুন, গড়ি সমৃদ্ধ
কৃষিনির্ভর বাংলাদেশ।

কৃষকের স্কুল

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, সফল কৃষকের গল্প এবং লাভজনক চাষাবাদ শিখতে এখনই যুক্ত হোন কৃষকের স্কুল–এর সাথে।

সাবস্ক্রাইব করুন:
https://www.youtube.com/
@KrishokerSchool

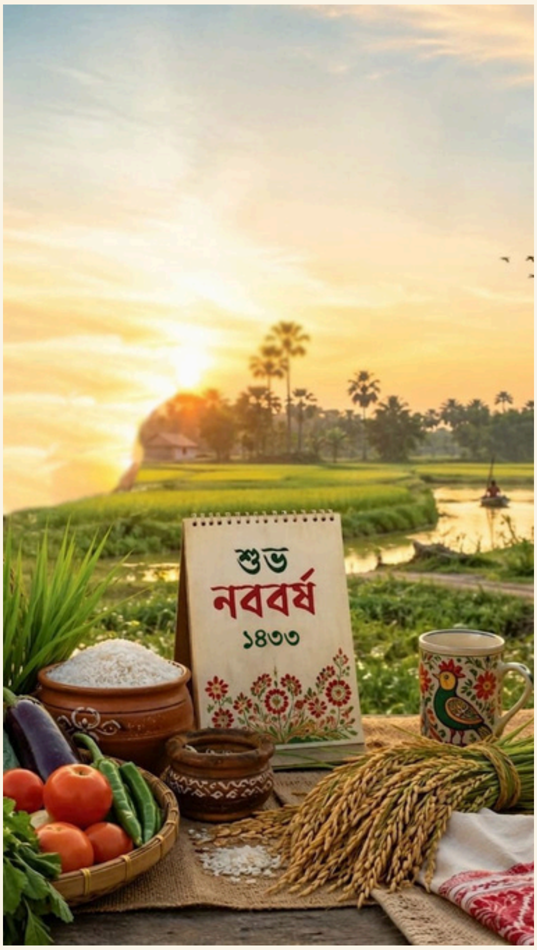

প্রতিটি ঋতুর কৃষি গল্প

ফসলিকা

চাষাবাদ ডটকম'র ঋতু ভিত্তিক ই-ম্যাগাজিন